يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকু'

হে ঈমানদারগণ![২৩] নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো[২৪] এবং তাদেরকে সালাম করো। এটি তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে।[২৫]

থেকে পবিত্র। এসবগুলো ব্যাখ্যার একটা অংশ আয়াতের শব্দাবলীর মধ্যে আছে। কিন্তু এ শব্দগুলো পড়ে প্রথমেই যে অর্থ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তা হচ্ছে, যা আমি প্রথমে বর্ণনা করে এসেছি এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দিক দিয়েও তার মধ্যে যে তাৎপর্য রয়েছে, অন্য অর্থগুলোর মধ্যে তা নেই।

২৩. সূরার শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল সমাজে অসৎপ্রবণতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কিভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে তা নির্ধারণ করা। এখন যেসব বিধান দেয়া হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে অসৎবৃত্তির উৎপত্তিই রোধ করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে সংশোধন করা যাতে করে এসব অসৎপ্রবণতা সৃষ্টির পথই বন্ধ হয়ে যায়। এসব বিধান অধ্যয়ন করার আগে দু'টি কথা ভালোভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে :

এক : অপবাদের ঘটনার পরপরই এ বিধান বর্ণনা করা পরিষ্কারভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, রসূলের স্ত্রীর মতো মহান ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এত বড় একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদের এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচারণাকে আল্লাহ তায়ালা একটি যৌন কামনাতাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির ফল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশকে পরিবর্তনের একমাত্র উপায় এটাই ছিল যে, লোকদের পরস্পরের গৃহে নিঃসংকোচে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হবে, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা সাক্ষাত ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার পথ রোধ করতে হবে, মেয়েদের একটি অতি নিকট পরিবেশের লোকজন ছাড়া গায়ের মুহাররম আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সামনে সাজসজ্জা করে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তির পেশাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে, পুরুষদের ও নারীদের দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখা যাবে না, এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরও বিবাহ দিতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, মেয়েদের পরদাহীনতা ও সমাজে বিপুল সংখ্যক লোকের অবিবাহিত থাকাই আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী এমন সব মৌলিক কার্যকারণ যেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশে একটি অননুভূত যৌন কামনা সর্বক্ষণ প্রবহমান থাকে এবং এ যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে লোকদের চোখ, কান, কণ্ঠ, মন-মানস সবকিছুই কোন বাস্তব বা কাল্পনিক কেলেংকারিতে (Scandal) জড়িত হবার জন্য সবসময় তৈরী থাকে। এ দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আলোচ্য পরদার বিধিসমূহের চেয়ে বেশী নির্ভুল, উপযোগী ও প্রভাবশালী অন্য কোন

কর্মপন্থা আল্লাহর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই ঃ এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. মূলে حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে حتى تستاذنوا (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। حتى تستاذنوا বললে আয়াতের অর্থ হতো ঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করেছেন। استيناس শব্দ انس ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন تستانسوا শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে ঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে "অনুমতি নেবা'র পরিবর্তে 'সম্মতি লাভ' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা حُيِّيتُم صَبَاحًا ،حُيِّيتُم مساءً (সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সওবান (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ননা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اذا دخل البصر فلا اذن

"দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?" (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, هكذا عنك ، فانما الاستيذان من النظر "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলের (সা) কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রসূলুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ননা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِىْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।" (আবু দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهٗ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

"যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنَهُ

"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"

ইমাম শাফেঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন–জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তরভুক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

তিন ঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা–বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, اتحب ان تراها عريانة "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?" (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, عليكم ان تستاذنوا على امهاتكم واخواتكم "নিজেদের মা–বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চার ঃ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচ ঃ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে

এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে الج (আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, السلام عليكم ادخل ؟ (আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন ঃ

السلام عليكم يارسول الله ايدخل عمر ؟

"আস্‌সালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" (আবু দাউদ)

অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয় ঃ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাত ঃ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ
قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।[২৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি[২৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে[২৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[২৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।[৩০] এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ ارجعوا (ফিরে যাও) এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে

দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলত হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ এখানে غَضٌّ মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কম করা, হ্রাস করা ও নিচু করা। غض بصر এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, "দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।" কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। مِنْ اَبْصَارِهِمْ এর মধ্যে مِنْ (মিন) "কিছু" বা "কতক" অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এখন পূর্বাপর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ

"হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে"। (তাবারানী)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ اَمْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا -

"যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশ'আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্'আম গোত্রের একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা) থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

দুই ঃ এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পরদা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পরদা তার অন্তরভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَأَنِىْ وَكَانَ قَدْ رَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ -

"তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি এক দম নিশ্চিন্তে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন ঃ ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নখ মেহেদী রঞ্জিত হতো।" আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহ্‌রামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা তিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন

আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম। (আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিন ঃ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন ঃ

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে।" (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ انظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا "মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে।" (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَّرٰى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -

"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আকৃষ্ট করে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে فلا جناح عليه শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকীহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসংগে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাযীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চার ঃ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ -

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ

আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[৩১] এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাজত করে[৩২] আর[৩৩] তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,[৩৪] যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।[৩৫] আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।[৩৬]

"কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন ঃ لاتنظر الى فخذ حى ولا ميت "কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ عورة الرجل مابين سرتة الى ركبته "পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।" (দারুকুত্নী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্ফার দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেন ঃ اما علمت ان الفخذ عورة ؟ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ لا تبرز (يا لا تكشف) فخذك "নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَايُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ -

"সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),

তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।" (তিরমিযী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন ঃ

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

"নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন ঃ فا الله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন্ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন্ পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, احتجبا منه "তার থেকে পরদা করো।" স্ত্রীরা বললেন ঃ

يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا

"হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।" বললেন ঃ افعميا وان انتما الستما تبصرانه "তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?" হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ذالك بعد ان امر بالحجاب "এটা যখন পরদার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা"। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? এ-তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেন ঃ لكنى انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।" অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আশা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী

করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অন্ধ। তুমি তার ওখানে নিসংকোচে থাকতে পারবে।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোন কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম গাযযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।" (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্তে পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাত্‌লা কাপড় পরে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ –

"হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।" (আবু দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন ঃ

اِذَا عَرَكَتِ الْمَرْاَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا اَنْ تُظْهِرَ اِلاَّ وَجْهَهَا وَاِلاَّ مَا دُوْنَ هٰذَا وَقَبَضَ عَلٰى ذِرَاعِ نَفْسِهٖ وَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهٖ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ اُخْرٰى –

"মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কব্জির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে।"

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন বাপ–ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমারেখার মতই। অর্থাৎ নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয়।

৩৪. আমি زِيْنَت শব্দের অনুবাদ করেছি "সাজসজ্জা"। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ" (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

৩৫. তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যথায় কথাটি মোটেই অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ অর্থাৎ "তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।" আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে اِلَّا শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।" এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোন আভরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে

চাদরটি জড়ানো থাকে, কারণ কোনক্রমেই তাকে লুকানো তো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতস্ফূর্তভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখ্‌ঈ। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির ما ظهر منها এর অর্থ নিয়েছেন ঃ ما يظهره الانسان على العادة الجارية (মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়) এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৮–৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন্ নিয়মে ما ظهر কে ما يظهر এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। "প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পরদাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তরভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩–২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে হযরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন ঃ সূরা নূর নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ বাক্যাংশ শোনার

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া[৩৭] স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,[৩৮] নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,[৩৯] ভাই,[৪০] ভাইয়ের ছেলে,[৪১] বোনের ছেলে,[৪২] নিজের মেলামেশার মেয়েদের,[৪৩] নিজের মালিকানাধীনদের,[৪৪] অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই[৪৫] এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।[৪৬] তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৪৭]

হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,[৪৮] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[৪৯]

পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন ঃ মহিলারা পাত্‌লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)

ওড়না পাত্‌লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে

দিয়েছেন। দেহ্ইয়াহ কাল্বী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিসরের তৈরী সূক্ষ্ম মল্‌মল্ (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে تجعل تحته ثوبا لا يصفها এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়।" (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়। ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছে তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।

৩৮. মূলে ابناء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তরভুক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মুরব্বীদের সামনেও।

৩৯. ছেলের অন্তরভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে।

৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

৪১. ভাইবোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তরভুক্ত।

৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী খতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে অনাত্মীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন সব আত্মীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকেও যেসব আত্মীয়দের থেকে পরদা করতে হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো দুধ চাচা ও দুধ মামা থেকেও পরদা করতে হযরত আয়েশাকে অনুমতি

দেননি। সিহাহেসিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবুল কু'আইসের ভাই আফ্লাহ তাঁর কাছে এলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পরদার হুকুম নাযিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইঝি, কারণ তুমি আমার ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুধপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের যেখানে পরদা উঠিয়ে দেয়া জায়েয এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে, এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পরদা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পরদা করা হবে। বরং তিনি এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তরভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। তাবে'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। (৩য় খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরন্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তরভুক্ত নয়। মেয়েরা নিসংকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পরদাও করবে না যেমন ভিন পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত তা শরীয়াতে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যি বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনাই পাই। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রসূলের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন পরদা ছিল না। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে এবং সে সময়ও এ অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)। অনুরূপভাবে হযরত উম্মেহানী ছিলেন আবু তালেবের মেয়ে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) সামনে আসতেন এবং কমপক্ষে তাঁর সামনে কখনো নিজের মুখ ও চেহারার পরদা করেননি। মক্কা বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, বাবুন ফীন নীয়্যাত ফিস সওমে ওয়ার রুখসাতে ফকীহ।) অন্যদিকে আমরা দেখি, হযরত আব্বাস তার ছেলে ফযলকে এবং রাবী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে পাঠালেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে গেছো, তোমরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, কাজেই তোমরা রসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হলেন। হযরত যয়নব ছিলেন ফযলের আপন ফুপাত বোন আর আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তাঁর ফযলের সাথে যেমন তেমনি আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে হাযির হলেন না এবং রসূলের (সা) উপস্থিতিতে পরদার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে ওপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগম্য হবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে আত্মীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম আত্মীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পরদা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদার (রা) এক ভাই ছিল বাঁদিপুত্র (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে (রা) তাঁর ভাই উত্‌বা এ মর্মে অসীয়াত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে তার অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার ঔরসজাত। এ মামলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হযরত সা'দের দাবী এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "যার বিছানায় সন্তানের জন্ম হয়েছে সে-ই সন্তানের পিতা। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।" কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হযরত সওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি থেকে পরদা করবে (احتجبى منه) কারণ সে যে সত্যিই তার ভাই এ ব্যাপারে নিসন্দেহ হওয়া যায়নি।

৪৩. মূলে نسائهن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের মহিলারা" এখানে কোন্ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বিতর্কে পরে আসা যাবে। এখন সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে নিছক "মহিলারা" (النساء) বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপরদা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয হয়ে যেতো। বরং نسائهن বলে মহিলাদের সাথে তার স্বাধীনতাকে সর্বাবস্থায় একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে গণ্ডী যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কোন্ গণ্ডী এবং সে মহিলারাই বা কারা যাদের ওপর نساء هن শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যাপারে ফকীহ ও মুফাস্‌সিরগণের উক্তি বিভিন্ন ঃ

একটি দল বলেন, এখানে কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। যিম্মী বা অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কেন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের থেকে পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পরদা করা উচিত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাহকে লেখেন, "আমি শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাম্মামে যাওয়া শুরু করেছে। অথচ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য তার শরীরের ওপর তার মিল্লাতের অন্তরভুক্তদের

ছাড়া অন্য কারোর দৃষ্টি পড়া হালাল নয়।" এ পত্র যখন হযরত আবু উবাইদাহ পান তখন তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! যেসব মুসলমান মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাম্মামে যায় তাদের মুখ যেন আখেরাতে কালো হয়ে যায়।" (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম রাযীর দৃষ্টিতে এ মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সত্যিই আল্লাহর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে তাহলে আবার نسائهن বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শুধু النساء বলা উচিত ছিল।

তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব নারীদের সাথে তারা মেলামেশা করে, যাদের সাথে তাদের জানাশোনা আছে, যাদের সাথে তারা সম্পর্ক রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গণ্ডীর বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিছু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিম্মী মহিলাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিন্নতা নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, লজ্জাশীলা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিসংকোচে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপরদা ও অসদাচারী হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পরদা করা উচিত। কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য ভিন পুরুষদের সাহচর্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার সীমানা আমাদের মতে গায়ের মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সর্বাধিক সীমানার সমপরিমাণ হতে পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অংগসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বাঁদী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তরভুক্ত হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পরদা করার ব্যাপারটি অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পরদার সমপর্যায়ের। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে মুসাইইব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম শাফেঈ'র একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীষীদের যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোলামী এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনভাবে

চলাফেরা করবে যার অনুমতি মুহাররাম পুরুষদের সামনে চলাফেরা করার জন্য দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, ما ملكت ايمانهن শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ শব্দাবলী যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে نِسَاءِهِنَّ বলা হয় তারপর বলা হয় مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ প্রথমে نساءهن শব্দ শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা আত্মীয়-স্বজনদের অন্তরভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তরভুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই ما ملكت ايمانهن বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়ই রয়েছে। এটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিমত। ইমাম শাফে'ঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর সপক্ষে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র ماملكت ايمانهن এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রসূল থেকেও এর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস্আদাতিল ফাযারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হযরত ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহ্বল ভাব দেখে বললেন, ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك "কোন দোষ নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম।" (আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালেকের উদ্ধৃতি থেকে। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমাকে এ গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর প্রতি চরম শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে আমীর মু'আবিয়ার একান্ত সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন—

اذا كان لاحد اكن مكاتب وكان له ما يودى فلتحتجب منه

"যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে "মুকাতাবাত" তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পরদা করা উচিত।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে)

৪৫. মূলে التابعين غير اولى الاربه من الرجال শব্দাবলী বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে

না।" এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যায়, এক, সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই, তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারিরীক অসামর্থ, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস থাকে না। এ হুকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়েতে নয় বরং আনুগত্য করার নিয়তে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্যি এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। মুফাস্সির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর বুলালে জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝেছেন তা জানা যেতে পারে ঃ

ইবনে আব্বাস ঃ এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

কাতাদাহ ঃ এমন পদানত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য তোমার পেছনে পড়ে থাকে।

মুজাহিদ ঃ এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না। থাকে।

শা'বী ঃ যে ব্যক্তি গৃহকর্তার অনুগত তার পদানত এবং যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি তাকাবার হিম্মত নেই।

ইবনে যায়েদ ঃ যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর দেবার হিম্মতই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে তাদের সাথে লেগে থাকে।

তাউস ও যুহ্রী ঃ নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর হিম্মতও নেই।

(ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৯৫–৯৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাখ্যাগুলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামাহ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ মদীনা তাইয়েবায় ছিল এক নপুংশক হিজড়ে। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে غير اولى الاربة এর মধ্যে গণ্য করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে

ক্ষান্ত হবেন না। তারপর সে বাদীয়ার সৌন্দর্য ও তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করতে থাকলো এমনকি তার গোপন অংগসমূহের প্রশংসামূলক বর্ণনাও দিয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই তো তাকে খুবই দক্ষ করে দেখেছিস বলে মনে হয়।" তারপর তিনি হুকুম দিলেন, তার সাথে পরদা করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর তিনি তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরকেও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতো। এ থেকে জানা যায়, কারো غير اولى الاربة (কামনাহীন) হবার জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যভিচার করতে সমর্থ নয় যদি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থেকে থাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় তাহলে অবশ্যি সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে।

৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। বড় জোর দশ-বারো বছরের ছেলেদের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে। এর বেশী বয়সের ছেলেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উন্মেষ হতে থাকে।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটিকে কেবলমাত্র অলংকারের ঝংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلْكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" (আবু দাউদ ও আহমাদ)

একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একটি মেয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি অনুভব করলেন মেয়েটি খোশবু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো?" সে বললো হাঁ। বললেন, "আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ)। আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْاَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيْدًا –

"যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশ্‌বু ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্‌কা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য এক হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভুল-ভ্রান্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও।

৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি ঃ

এক ঃ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।" (তিরমিযী)

হযরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِاِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহর (সা) নিজের সতর্কতা এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি হযরত সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

দুই ঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের আই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।" (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

তিন ঃ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ -

"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে।"

এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, فانطلق فحج مع امرأتك "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের ওপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ঘটনার যেমন যেমন অবস্থা রসূলের (সা) সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হুকুম

বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন মহিলা যাচ্ছেন তিন দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

চার ঃ রসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুম্আকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকুত্নী ও হাকেম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামায ফরয হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুকুত্নী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরীক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি। বরং এর অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর (রা) ও আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" (আবু দাউদ) অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলী সহকারে ঃ

ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل

"মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن

"তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসজিদে

নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো।" (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن "মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।" (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, "যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) নিজের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই'তিযালুন নিসা ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্টতম লাইনটি হচ্ছে সবার পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইনটি। আর মহিলাদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ) দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, পথে নারী–পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন,

اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ-

"থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।" এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একেবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী–পুরুষের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাপ্পা! যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, ক্লাব–রেস্তরাঁ ও সভা–সমিতিতে তাদের মিশ্রিত হওয়াকে বৈধ করে দেবে?

পাঁচ ঃ নারীদেরকে ভারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন ঃ

- নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লম্বা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।
- ভূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ নির্মাণ করা এবং লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।
- দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাত্‌লা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরী করা।
- জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা।

এসব বিধান সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব পরিষ্কার নির্দেশ দেখার পর একজন মু'মিনের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে। এক, সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। দুই, যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে ও তাকে গোনাহ বলে স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পরদার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসুলভ ধৃষ্টতাও দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নৈতিক সাহসের স্বীকৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের